রাজনীতির চোরাবালি ও আমাদের শিক্ষা

সকালের পত্রিকায়ই পড়লাম নির্বাচনে ভোটপ্রার্থীদের কর্মীদের মধ্যে অনেক জায়গায় মারামারি শুরু হয়ে গেছে, রীতিমতো কোপাকুপি। আমরা এদেশে জন-মানসিকতাকে দু-ভাগে ভাগ করতে পারি– ১. স্বাভাবিক মানসিকতা; ও ২. রাজনৈতিক বিকৃত মানসিকতা। যারা আমজনতা, কারো সাতে-পাঁচে নেই, 'অন্ন চিন্তা চমৎকার'– তাদের স্বাভাবিক মানসিকতার ধারক বলে মেনে নেওয়া যায়। রাজনৈতিক মানসিকতার ধারকদের কাণ্ডজ্ঞান ও ঐচিত্যবোধ বলতে কিছুই থাকে না। রাজনৈতিক সভায় চেয়ারে বসা নিয়েই যেখানে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যায়, সত্য-মিথ্যার বাচবিচার না করে যে কোনো কথা বলে দিতে পারে, আত্মজিজ্ঞাসার অভাব। এমনই হাজারো অব্যবস্থাপনা ও জিঘাংসা যেখানে নিত্য ঘটে– এসবই রাজনৈতিক বিকৃত মানসিকতা। আমরা জানি আগামী মাসে নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়েছে। দেখছি নির্বাচন প্রতিযোগিতা, আসন ভাগাভাগি ইতোমধ্যেই শেষ। যিনি বরের মা, তিনিই তো কনেরও মা। তবে কেন আবার এ নিয়ে মারামারি? এত রিহার্সল? তবে কেন এ প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ?

অনুসন্ধিৎসু পাঠকমহল আমাকে জানেন, আমি এদেশের রাজনৈতিক দলের এহেন মানসিকতাকে ভালো চোখে কোনোদিনই দেখিনে। এগুলোকে ভালো চোখে দেখতে গেলে আগে আমার পেশা বদল করতে হবে। এসবের জন্য আমি রাজনীতিকে দায়ী করি না, দায়ী করি 'মহান রাজনীতিক'দের মানসিকতাকে। এধরণের রাজনৈতিক মানসিকতার লোকে পুরো দেশটা ছেয়ে গেছে। জীবনের প্রতিটা পর্যায়ে 'মুখে এক, অন্তরে আরেক' কিসিমের লোকের সমারোহ। রাজনীতি ও নির্বাচন যে পথে গেছে, এদেশের সমাজ, সামাজিক শিক্ষাও সেই পথে গেছে। সমাজ ও সামাজিক শিক্ষার পিছু পিছু চলেছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। শিক্ষা নিয়ে আজ কিছু লিখতে চেয়েছিলাম। অনেকেই পত্রিকায় তাদের বিভিন্ন মতামত এ নিয়ে প্রকাশ করে চলেছেন। আমারও সে-ইচ্ছে। এতক্ষণে যা লিখছি তা মূলত গৌরচন্দ্রিকা।

রাজনীতির ধরন-ধারণ, সমাজ ও সামাজিক শিক্ষার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সরাসরি সহগামী সম্পর্ক আছে। রাজনীতি ও সামাজিক শিক্ষা যত নীচে নামবে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গতিও সেদিকে যাবে। রাজনৈতিক বিকৃত মানসিকতার অস্থিত্ব এদেশে অবস্থান করলে শিক্ষার মান কোনো দিনই বাড়বে না, একথা নির্ভেজাল সত্য। বিকৃত মানসিকতার চর্চা যতদিন থাকবে– শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, টাকার বিনিময়ে অযোগ্য দলীয় লোকের নিয়োগ-বাণিজ্য, স্বজনপ্রীতি ততদিন থাকবে। আইনের শাসন যতদিন এদেশে ফিরে না আসবে, শিক্ষা ভালো পথে ফিরে আসতে পারে না, তা আমরা যত হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেই শিক্ষানীতি তৈরি করিনা কেন। আমি এসব কথা বলে পরিবেশকে বোঝাতে চাচ্ছি। সুস্থ পরিবেশের সাথে শিক্ষার উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আমি সব সময় জীবনের বাস্তবতা দিয়ে উদাহরণ দেই। একজন শিক্ষক হয়ে যত জায়গায়ই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা সমাজকর্মে সুনীতি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছি, দুর্নীতিবাজরাই দুর্নীতি করে আমাকে আবার পাল্টা দুর্নীতিবাজ বলে পিছু হটিয়েছে। বর্তমানেও এমনই একটা সমাজ-কর্ম করতে গিয়ে মান-সম্মান ও নীতি নিয়ে সরে আসা দায় হয়ে উঠেছে। এ অবস্থা সর্বত্র। সমাজে বসবাসরত অধিকাংশ মানুষ লা-জবাবি হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে। প্রতিবাদে এগিয়ে আসে না। অথচ ভালো ফল পেতে চায়। যে সমাজে জাগ্রত বিবেকবোধের দংশন নেই, দেশ জুড়ে অন্যায়-অবিচারের দৌরাত্ম্য, রাজনৈতিক বিকৃত পরিবেশ থেকে অন্যায়-অবিচার সমাজের লোকজন প্রকাশ্য শিখছে। সেখানে ন্যায় ও সুশিক্ষা কীভাবে প্রতিষ্ঠা করবেন? দিন যত যাচ্ছে, সামাজিক সুশিক্ষার পরিবেশ, সুস্থ চিন্তার বিকাশ তত উচ্ছন্নে যাচ্ছে। আমরা নিজের জাগ্রত বিবেককে বিসর্জন দিয়ে কোনো ব্যক্তিস্বার্থ বা রাজনীতির ধামাধরা হয়ে বসে আছি। সকল অন্যায়-অপরাধ ওপেন-সিক্রেট হয়ে গেছে। আত্মবিশ্লেষণ অশিক্ষা-কুশিক্ষার শুঁড়ি-পোকার দৌরাত্ম্যে নিজের

অজান্তেই বিলীন হয়ে গেছে। আমরা বুলিসর্বস্ব আদম সন্তানে পরিণত হয়ে গেছি। মুখে এক কথা বলছি, অন্তরে ভিন্নটা। ইসলামি লিটারেচারে যাকে 'মোনাফেক' বলে জানি। আমি অনেক লোকের মধ্যে মোনাফেকি আচরণ দেখছি, কিন্তু তাকে বলার পরিবেশ নেই। সে-ই বরং আমাকে মোনাফেক, কখনো-বা দুর্নীতিবাজ আখ্যায়িত করে স্বদম্ভে সমাজে বুক ফুলিয়ে চলছে। এ অবস্থা দেখে আমি যে এই শেষ জীবনে বড্ড ক্লান্ত ও শ্রান্ত বোধ করছি! শুধু ভাবছি, এ থেকে আর কতদিনে এদেশের সাধারণ মানুষ নিস্তার পাবে! আমি শুধু রাজনীতির পরিবেশের কথাই বলছি না, সমাজের প্রতিটা পর্যায়ে, রন্দ্রে রন্দ্রে এ অশুভ বিলয়-চক্র প্রবল আকার ধারণ করেছে, অপকর্ম নিত্য-নির্নিমেষ বিদ্যমান। এ শোচনীয় অবস্থা রাজনীতির তখত-তাউস (ফারসি তখত + আরবি ত্বাউস) থেকে গরু-মোষের হাট পর্যন্ত বিসারিত।

পল্লিকবি জসিম উদ্দিনের কবিতায় পড়েছিলাম, 'সেই সোনামুখ গোলগাল হাত সকলি তেমনই আছে, কি জানি সাপের দংশন পেয়ে মা আমার চলে গেছে'। সোনামুখ, গোলগাল হাত থেকে কী লাভ! মা-ই যদি চলে যায়! কবর তখন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। আমরা কি 'মা' চলে যাওয়া ঠেকাতে পারি না? মনুষ্যত্বই যদি না থাকে তবে মানুষ থাকে কি করে? স্কুল-কলেজের বড় বড় বিল্ডিং, লাখ লাখ শিক্ষক, সবুজ খেলার মাঠ, শিক্ষা অফিসার, শিক্ষার জন্য মন্ত্রণালয়, হাজার হাজার কোটি টাকার বাজেট– কী হবে এসব করে, শিক্ষাই যদি না থাকে? সামাজিক শিক্ষাই যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়? পড়া আর না-পড়া যদি একাকার হয়ে যায়? শিক্ষিত লোক আর অশিক্ষিত লোকের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়ার মতো যদি কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকে? আমি তো অনেক শিক্ষক– এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনেকের মধ্যেও শিক্ষা খুঁজে পাই না। একটা কেস-স্ট্যাডি গল্প আকারে বলছি। শিক্ষার দশা নিয়ে আলোচনা করছি বলেই বলছি। কয়েকদিন আগে একটা সামাজিক কাজে অনেকবার মিটিংয়ে বসতে হয়েছিল। সবাই উচ্চপদস্থ সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, ভদ্র-মার্জিত রুচির লোক। এক অখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে সেখানে পেলাম– তার ভাষাজ্ঞান ও পরিবেশজ্ঞান জঘণ্য, মন-মানসিকতা খুবই নিম্নমানের। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিষদের মিটিংয়ে বিরোধী গ্রুপের সাথে যা করে অভ্যস্ত, সেমতো এখানেও কথায় কথায় জামার হাতা গুটিয়ে ভদ্রলোকদের দিকে তেড়ে আসছেন, চুগলখোরি করেন। মিটিং শেষে মিটিংয়ের তথ্য ডক্যুমেন্টসহ পাচার করেন। নিজেকে খুব উঁচু ভাবেন। আমিও শিক্ষক হওয়ায় নিজেকে লজ্জিত বোধ করলাম। তার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিলাম। সেখানে আমার অসংখ্য ছাত্র বর্তমানে প্রফেসর। খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনি ছাত্র-রাজনীতির ক্যাডার ছিলেন। নব্বইয়ের দশকে রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে শিক্ষক হয়েছিলেন। তিনি সমাজকে ও ছাত্রদের কী শিক্ষা দেবেন! এই তো আমাদের দেশীয় শিক্ষানীতি! কতিপয় এমন দলবাজ, বিকৃতমনা ও দুর্নীতিবাজ শিক্ষকদের দৌরাত্ম্যে আমাদের সকল পর্যায়ের শিক্ষাঙ্গণের পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে।

আমরা শুধু সার্টিফিকেট প্রাপ্তি ও রাজনৈতিক আনুগত্যের দিকে ঝুঁকছি বলেই দেশ ও জীবনের সব ক্ষেত্রে এ উড়নচণ্ডী দশা। এ দশা দেশের প্রশাসন, ভোটের মাঠ ও শোবারঘর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। এ অজ্ঞতা ও মূর্খতা এ সমাজের মানুষের মনুষ্যত্বের ওপর হানা দিয়েছে। মানুষকে অমানুষ ও নির্লজ্জ বানিয়েছে। যে জাতি যত শিক্ষিত, বিশ্বের মানচিত্রে সে জাতির মর্যাদা ও অবস্থান তত সুসংহত ও সুসমৃদ্ধ। শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি, তা-ই তো আমরা পরিষ্কার করে বলি না। এ পত্রিকায়ই অনেকবার লিখেছি, শিক্ষা হতে হবে তিনটি উপাদানের সম্মিলন– জীবনমুখী শিক্ষা, মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষা এবং কর্মমুখী শিক্ষা। সে প্রচেষ্টা কোথায়? সে-কথা কি কোনো পক্ষ কানে তুলেছেন? শিক্ষা নিয়েও দলবাজি, স্বজনপ্রীতি, মতলববাজি, মনের কোণে লুকিয়ে রাখা পরিত্যক্ত মতবাদ। এগুলোই বাঙালি জাতির স্বকীয় সত্তা ধ্বংসের পূর্ববার্তা। কেউবা আমাদের বাঙালিকে লেখাপড়া শিখিয়ে ইংরেজ বানাতে চায়, কেউবা চায় জাপানি বানাতে, কেউবা চায় আমেরিকান বানাতে। যে দেশ যখন ভ্রমণ করে আসে, সে-দেশের

কালচার, শিক্ষাব্যবস্থা, সিলেবাসসহ কপি করে নিয়ে আসে। এখানে এসে শুধু পেস্ট করে দেয়। বাঙালির সমাজবোধ, রীতিনীতি, চৈতন্যবোধ, সামাজিকতা, মূল্যবোধ, সামাজিক বুনন, দেশীয় সংস্কৃতি ও পারিবারিক কাঠামো যে ভিন্ন ধরনের– সেসব বেমালুম ভুলে যায়। আমরা নিজেদের জাতিগত স্বকীয় অস্তিত্বকে বজায় রেখে শিক্ষিত হতে চাইনে, চাই অন্য জাতির মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে। আমাদের চিন্তার এ দীনতা ও হীনতা পাঠক্রমের মধ্যে প্রকাশ পায়। জাতিগত সত্তা গঠনে প্রায়ই প্রকাশ পায় না। একটা সজীব ও চলমান জাতি তো কোনো একচোখা বুদ্ধিজীবীর নিগড়ে বন্দী হতে পারে না। তাতে জাতি পথ হারায়, অন্য জাতির মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। সে জন্য কোনো শিক্ষানীতি বা পাঠক্রম দলনিরপেক্ষ সুশিক্ষিত একদল লোকের হাতে করানোই উচিত। আমি তো একথা প্রায়ই বলি, লেখা ও পড়া অনেক ভালো জানলেই তাকে সুশিক্ষিত লোকের খাতায় নাম লেখানো যায় না। রাজনীতিকদেরও আমি এ বিষয়টা ভেবে দেখতে বলি। রাজনীতির মারপ্যাচ আর শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি এক বিষয় নয়।

সদ্য প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে নানাজন নানাভাবে সমালোচনা করছেন। অনেক ক্ষেত্রেই আমি দ্বিমত পোষণ করি। এ শিক্ষাব্যবস্থার সবটুকুই খারাপ নয়। এর অনেক ভালো দিকও আছে। এদেশের প্রায় প্রতিটা পরিকল্পনারই তো বাস্তবায়ন সমস্যা। এ শিক্ষাব্যবস্থারও বাস্তবায়ন সমস্যা রয়ে গেছে, যা অল্প দু-এক বছরেই বোঝা যাবে। অব্যবহিত আগের শিক্ষাব্যবস্থারও বাস্তবায়ন সমস্যা ছিল। যে একটি দোষে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকেই আমরা 'খুব খারাপ','খুব খারাপ' বলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। ওস্তাদ যদি দাঁড়িয়ে কীর্তন গায়, শিষ্যরা আবার পাক দিয়ে নাচে, ওস্তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে। আমরা নতুন শিক্ষা-প্রজেক্ট নামে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছি। এতে অনেক পক্ষেরই পকেট ভারী হয়েছে। এদেশে সরকারি টাকা বরাদ্দ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে তো আমরা বেশ উদার। 'নাচতে জানি না, উঠান বাঁকা' বলে কৃতিত্ব জাহির করি। অথচ অব্যবহিত আগের পাঠক্রমের বাস্তবায়ন সমস্যাগুলো, দুর্বলতাগুলো কিছু টাকা খরচ করে দূর করে নিলেই ভালোভাবে চলতো। বিশ্বের অনেক দেশে ঐ 'ব্লুমস্ ট্যাক্সোনমি' দিয়েই তো এখনোও চলছে। সাথে এখন যোগ করেছে 'আউটকাম বেইজড এডুকেশন'। মূলত দুটো পদ্ধতি বেশ কাছাকাছি। আমাদের দেশে 'সৃজনশীল পদ্ধতি'ও ছিল 'ব্লুমস্ ট্যাক্সোনমি'র একটা প্রায়োগিক অংশ, নতুন কিছু নয়। আমরা সেটা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। আমাদের ব্যর্থতার দায় পাঠক্রমের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি। বাস্তবায়ন হয় না দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার কারণে; দোষ গিয়ে পড়ে পাঠক্রমের ওপর। বর্তমান পাঠক্রমের মূল্যায়ন পদ্ধতিসহ বেশ কিছু পরিবর্তন জরুরি, এটা মানি। কিন্তু ছুঁড়ে ফেলার মতো নয়। সিলেবাস পরিবর্তন একটা চলমান প্রক্রিয়া। এটাতে হাত দিলেই হয়। এর জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ লাগে না। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা উঠিয়ে দিতে চাইলেও তেমন একটা খরচের প্রয়োজন হয় না। আগে দেশের রাজনীতি ও সমাজ থেকে মিথ্যাচার, অনাচার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দুরাচারবৃত্তি, অবৈধ টাকার খেলা দূর করা অবশ্যম্ভাবী, তাহলেই শিক্ষাব্যবস্থা ভালো হয়ে যাবে। আমারা শিক্ষার প্রতিটা পর্যায়ে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি করে অসংখ্য অযোগ্য, দলবাজ, বিকৃত-মানসিকতার জনবল ইতোমধ্যে নিয়োগ দিয়ে ফেলেছি। এর প্রভাব তো আগে আমাদেরই ভোগ করতে হবে। জমিতে বপন করবো পোকায় খাওয়া নিম্ন জাতের গম আর ফসল ঘরে তুলবো উন্নত ফলনশীল মোটা-দানার গম, তা কী করে হয়?

নতুন সিলেবাসে কোনো কোনো শ্রেণিতে আমরা ছাত্রছাত্রীদের রান্নাবান্নার কাজ শেখাতে চাই। এর জন্য বাড়ি থেকে রান্না করে স্কুলে আনতে বললে রান্না শেখার কি দশা হবে আমরা সবাই জানি। বাজার করবেন বাবা, রান্না করবেন মা। স্কুলে আনার পর পেট পুরে ভোজন করবেন শিক্ষাগুরুরা। রান্না শেখা ঐ পর্যন্তই। কোনো কাজের ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার আগে বাঙালির সামাজিক চরিত্র ভেবে দেখা একান্ত প্রয়োজন। আমরা আগে ভাবিনে। পোস্ট-মর্টেম করার

পরে টের পাই। ততক্ষণে রোগীর কর্ম কাবার। এমনটিই হবে সিলেবাসভুক্ত আরো অনেক কিছু শেখার অবস্থা। এত অল্প পরিসরে সব বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সবকিছু করতেই দেশীয় পরিবেশ বিবেচনার দাবি রাখে, যেটা আমরা সুকৌশলে এড়িয়ে যায়। ফল যা হওয়ার তা-ই হয়।

(২৯ ডিসেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ